بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মোতাবেক ০৫ তাবুক, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুদের তিরন্দাজদের কারণে মুসলিম সেনাবাহিনীতে যে ভীতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা নূর-এর ৬৪ নম্বর আয়াতের তফসীরে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যে, নবীর আনুগত্য কীভাবে করা উচিত। আয়াতটি হলো:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (সূরা নূর: ৬৪)

এর অনুবাদ হলো: হে মু'মিনরা! তোমরা একথা মনে কোরো না যে, রসূলের তোমাদের কাউকে ডাকা তোমাদের একে অপরকে ডাকার মতো। আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্য থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে পরামর্শ সভা থেকে পালিয়ে যায়। অতএব যারা এই রসূলের আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের ওপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনো বিপদ এসে না পড়ে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত না হয়।

তিনি (রা.) বলেন, ইমামের আহ্বানের বিপরীতে সাধারণের ডাকের কোনো গুরুত্ব নেই। তোমাদের কর্তব্য হলো, যখনই তোমাদের কানে আল্লাহ্ তা'লার রসূলের ডাক আসবে, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাতে লাব্বায়েক বলে সাড়া দেবে এবং তা পালনের জন্য দৌড়ে যাবে, কারণ এতেই তোমাদের উন্নতির রহস্য লুকিয়ে আছে। বরং যদি মানুষ সেই সময় নামাযরতও থাকে, তবুও তার কর্তব্য হলো– সে যেন নামায ভেঙে আল্লাহ্ তা'লার রসূলের আহ্বানে সাড়া দেয়। যাহোক, নবীর ডাকে তৎক্ষণাৎ লাব্বায়েক বলে সাড়া দেওয়া একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, বরং (এটি) ঈমানের চিহ্নগুলোর মধ্য থেকে একটি বড়ো বিশেষ চিহ্ন। আর আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, হে মু'মিনরা! যদি কখনো আল্লাহ্ তা'লার রসূল তোমাদের ডাকেন, তাহলে তাঁর ডাককে অন্যদের ডাকের মতো মনে কোরো না, বরং তৎক্ষণাৎ তাঁর আওয়াজে লাব্বায়েক বলে সাড়া দেবে। অর্থাৎ, তিনি যেন বলে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দুটি পৃথক পৃথক মর্যাদা রয়েছে– একটি পার্থিব অধিকর্তা হবার দিক থেকে এবং একটি নবী হবার দিক থেকে। পার্থিব নেতা হবার দিক থেকেও তাঁর আদেশসমূহ মানা অত্যাবশ্যক, কিন্তু ধর্মীয় নেতা হবার দিক থেকে তো তাঁর আহ্বানে লাব্বায়েক বলে সাড়া দেওয়া আরো বেশি অগ্রগণ্য। তিনি এখানে এর (তথা উক্ত আয়াতের) তফসীর বা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুনাইনের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, ইতিহাস থেকে জানা যায়, হুনাইনের যুদ্ধের সময় যখন মক্কার কাফিররা ইসলামী সেনাবাহিনীতে এই বলে যোগদান করে যে, আজ আমরা আমাদের বীরত্বের ঝলক দেখাবো; অতঃপর বনু সাকীফের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়– তখন এমন একটি সময় এসেছিল যখন মহানবী (সা.)-এর চারদিকে মাত্র বারোজন সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন। দশ হাজার সৈন্যের ইসলামী সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর

কাফিরদের সেনাবাহিনী ছিল তিন হাজার তিরন্দাজ নিয়ে গঠিত; তারা তাঁর (সা.) ডানে-বামে পাহাড়ে উঠে তাঁর ওপর তির বর্ষণ করছিল। কিন্তু সেই সময়েও তিনি (সা.) পিছু হটতে চান নি, বরং এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) উদ্‌বিগ্ন হয়ে তাঁর (সা.) বাহনের লাগাম ধরে ফেলেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার প্রাণ আপনার জন্য নিবেদিত! এখন এগিয়ে যাবার সময় নয়। এক্ষুনি ইসলামী সেনাবাহিনী একত্রিত হয়ে যাবে, তারপর আমরা এগিয়ে যাব। কিন্তু তিনি (সা.) অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বলেন, আমার বাহনের লাগাম ছেড়ে দাও! অতঃপর (বাহনকে) গোড়ালি দিয়ে আঘাত করে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করেন এবং বলতে থাকেন: انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب অর্থাৎ, আমি সেই প্রতিশ্রুত নবী যার সুরক্ষার চিরন্তন প্রতিশ্রুতি রয়েছে; আমি মিথ্যাবাদী নই। তাই তোমরা তিন হাজার তিরন্দাজ হও বা ত্রিশ হাজার, আমি তোমাদের কোনো পরোয়া করি না। আর হে মুশরিকরা! আমার এই বীরত্ব দেখে আবার তোমরা আমাকে খোদা মনে কোরো না। আমি একজন মানুষ এবং তোমাদের সর্দার আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র, অর্থাৎ নাতি। তাঁর চাচা হযরত আব্বাসের গলার স্বর অনেক উঁচু ছিল। তিনি (সা.) তার দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আব্বাস! এগিয়ে এসো এবং ডাক দাও আর উচ্চৈঃস্বরে ডাকো– হে সূরা বাকারার সাহাবীগণ! [অর্থাৎ যারা সূরা বাকারা মুখস্থ করেছে।] হে হুদাইবিয়ার দিন গাছের নীচে বয়আত গ্রহণকারীগণ! আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের ডাকছেন।

একজন সাহাবী বলেন, মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানদের কাপুরুষতার কারণে যখন ইসলামী সেনাবাহিনীর অগ্রভাগ পেছনের দিকে পালায়, তখন আমাদের বাহনগুলোও দৌড়াতে শুরু করে এবং আমরা যত বাধা দিতাম, তত বেশি সেগুলো পেছনের দিকে পালাতে থাকে। এমন সময় আব্বাসের আওয়াজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে– হে সূরা বাকারার সাহাবীগণ! [এখানে বিশেষভাবে সূরা বাকারার নাম নিয়ে এজন্য ডাকা হয়েছিল, কারণ এটিই ছিল মদীনায় অবতীর্ণ সর্বপ্রথম সূরা এবং এই সূরায় এ আয়াতগুলোও রয়েছে যে, স্বল্প কিছু লোক অধিক লোকের ওপর আল্লাহ্‌র আদেশে বিজয়ী হয়, আর এতে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করারও শিক্ষা রয়েছে।] হে হুদাইবিয়ার দিন গাছের নীচে বয়আত গ্রহণকারীগণ! আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের ডাকছেন। এই আওয়াজ যখন আমার কানে পৌঁছে, তখন আমার মনে হলো যেন আমি জীবিত নই, বরং মৃত। আর ইসরাফীলের শিঙা আকাশে ধ্বনিত হচ্ছে। আমি আমার উটের লাগাম জোরে টেনে ধরি এবং এর মাথা পিঠের সাথে লেগে যায়, কিন্তু সেটি এতটাই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, আমি লাগামে ঢিল দিতেই সেটি আবার পেছনের দিকে দৌড়াতে থাকে। এতে আমি এবং আমার অনেক সাথি তরবারি বের করে নিই, আর অনেকেই উট থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং অনেকে উটের গলা কেটে দেয় আর মহানবী (সা.)-এর দিকে দৌড়ে যেতে থাকে। আর কয়েক মুহূর্তেই সেই দশ হাজার সাহাবীর সেনাবাহিনী যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মক্কার দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তাঁর (সা.) চতুর্দিকে একত্রিত হয়ে যায় এবং অল্প সময়েই পাহাড়ে উঠে তারা শত্রুদের ধ্বংস করে দেয় এবং এই বিপজ্জনক পরাজয় একটি মহান বিজয়ে রূপ নেয়।

অনুরূপভাবে তাঁর (রা.) 'উসওয়ায়ে হাসানা' শীর্ষক একটি বক্তৃতায়ও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করেন যে, মক্কা বিজয়ের পর যখন মহানবী (সা.) কিছু আরব গোত্রের মোকাবিলার জন্য হুনাইনের যুদ্ধে গমন করেন, তখন যেহেতু মক্কায় অনেক লোক সবেমাত্র মুসলমান হয়েছিল, সেজন্য তারাও মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগ দিয়েছিল।

আর যারা তখনো মুসলমান হয় নি, তারাও শুধুমাত্র জাঁকজমক প্রদর্শন ও জাতীয় উদ্দীপনার কারণে মুসলমানদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। আর তারা তাদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তি নিয়ে অহংকার শুরু করে দেয় এবং বলতে থাকে, আমাদের সংখ্যা আজ অনেক, আজ আমাদের কেউ পরাজিত করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই অহংকারের শাস্তি দেবার জন্য এমন ব্যবস্থা করেন যে, মুসলমানদের সেনাবাহিনী যখন অগ্রসর হয় তখন শত্রুরা গোপন স্থানে লুকিয়ে পড়ে এবং তাদের বড়ো বড়ো দক্ষ তিরন্দাজদের কিছু ডান পাশে লুকিয়ে বসে থাকে এবং কিছু বাম পাশে লুকিয়ে বসে থাকে। সেনাবাহিনী যখন সেই স্থান দিয়ে অতিক্রম করে যার ডানে-বামে হাজার হাজার তিরন্দাজ লুকিয়ে বসে ছিল, তখন তারা আচমকা ইসলামী সেনাবাহিনীর ওপর বৃষ্টির মতো তির ছোড়ে। এটা দেখে সেই 'হাদীসুল আহাদ' অর্থাৎ নবীন ও নতুন মুসলমানরা– যাদের মধ্যে এখনও দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল, এবং মক্কার সেই কাফিররা– যারা শুধু জাতীয় উদ্দীপনার কারণে মুসলমানদের সাথে যোগ দিয়েছিল– তারা দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। এমতাবস্থায় যখন প্রথম সারির লোকেরা পালিয়ে যায়, তখন আবশ্যিকভাবে পেছনে আগমনকারীদের ঘোড়াও ভড়কে যায় এবং সেগুলোও পালাতে শুরু করে। এই যুদ্ধেও এমনটাই ঘটেছে। যখন সেসব অনভিজ্ঞ মুসলমান এবং কাফির তিরের বৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যায়, তখন সাহাবীদের ঘোড়া ও উটগুলোও পালাতে আরম্ভ করে। আর পুরো ইসলামী সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই বিপদ এমন সীমায় পৌঁছায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আশেপাশে শুধু বারোজন অবশিষ্ট রয়ে যায়, অন্য সবাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। এটি দেখে হযরত আব্বাস (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলেন এবং নিবেদন করেন, এখন কালক্ষেপণের সুযোগ নেই; ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফেলুন এবং ফেরত চলুন, যেন ইসলামী সেনাবাহিনীকে পুনরায় একত্রিত করে আক্রমণ করা যায়। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, খোদার নবী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না। এটি বলে তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরেন এবং সেটিকে হাঁকিয়ে আরো এগিয়ে নিয়ে যান এবং বলেন, انا النبی لا كذب انا ابن عبد المطلب অর্থাৎ, আমি খোদার নবী, মিথ্যাবাদী নই। আমি আজ যে এসব তিরন্দাজকে কারণে ভয় পাই নি এবং চার হাজার তিরন্দাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও সামনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি– এই দৃশ্য দেখে কেউ এটি মনে কোরো না যে, আমি খোদা অথবা আমার মাঝে ঐশ্বরিক গুণাবলি বিদ্যমান। স্মরণ রেখো! আমি খোদা নই। আমি সেই আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। কিন্তু এই লোকেরা খোদার প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। [অর্থাৎ, নবী, রসূল ও আল্লাহ্‌র ওলী যারা হন– তারা খোদার প্রতিচ্ছবি হন, খোদাকে প্রদর্শনকারী হন।] যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং শত্রুরা আনন্দিত হয় যে, তারা মুসলমানদের মেরে ফেলেছে– তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আব্বাসকে (রা.) সম্বোধন করে বলেন, আব্বাস! ডাক দাও– হে আনসার! আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের ডাকছেন। যখন হযরত আব্বাস (রা.) উচ্চৈঃস্বরে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করেন, হে আনসার! আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের ডাকছেন– তখনকার কথা একজন আনসার এভাবে বর্ণনা করেন: সে সময় অবস্থা এমন ছিল যে, আমাদের ঘোড়া ও উট আমাদের কব্জা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল, যেন মক্কা বা মদীনায় না পৌঁছানো পর্যন্ত এগুলো থামবে না। সেগুলো মক্কার হাজার হাজার লোকের পালানোর কারণে এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, কোনোভাবেই ফেরত আসছিল না। আমরা আমাদের বাহনগুলোর লাগাম ধরে টানছিলাম এবং এত শক্তি প্রয়োগ করছিলাম যে, সেগুলোর মুখ

সেগুলোর লেজকে স্পর্শ করছিল; কিন্তু ফেরত আসার পরিবর্তে সেগুলো পেছনের দিকেই ছুটছিল। আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমাদের কানে হযরত আব্বাসের (রা.) এই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, হে আনসার! আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের ডাকছেন। তিনি বলেন, এই আওয়াজ শুনতেই আমাদের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের মনে হচ্ছিল না– কোনো মানুষ আমাদেরকে ডাকছেন; বরং আমাদের মনে হচ্ছিল যেন তা কিয়ামতের দিন, এবং মৃত রূহগুলোকে জীবিত করার জন্য ইসরাফীলের শিঙায় ফুঁ দেওয়া হচ্ছে। সে সময় পৃথিবী ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে সেসবের কোনো জ্ঞান আমাদের ছিল না। শুধু একটি আওয়াজই আমাদের কানে বাজছিল, আর সেটি ছিল আব্বাসের আওয়াজ। সে সময় আমাদের সব দুর্বলতা দূর হয়ে যায় এবং হয় আমাদের মাঝে এই অনুভূতি কাজ করছিল যে, আমরা আমাদের ঘোড়া ও উটগুলোকে থামাতে পারছি না, অথবা আমরা শেষবারের মতো আরেকবার জোর খাটালাম এবং নিজেদের ঘোড়া ও উটগুলোকে পেছন ফেরানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করলাম। যেগুলো ফিরল সেগুলো তো ফিরলই; আর যেগুলো ফিরল না– আমরা তরবারি বের করে সেগুলোর গলা কাটলাম এবং পায়ে দৌড়েই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে পৌঁছে গেলাম। এরা ছিলেন সেসব লোক যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঈমান দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। যেভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা এমন ছিল যে, যতই বিপদ হোক– আল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টির আড়াল হতেন না, তেমনিভাবে তাঁর (সা.) তরবিয়তের প্রভাবে এই মর্যাদা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে সাহাবীদের মাঝেও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

মহানবী (সা.)-এর সাথে কারা অবিচল ছিলেন– সে সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি হুনাইনের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। মুসলমানরা পালিয়ে যায় আর তাঁর (সা.) সাথে মুহাজির ও আনসারের মধ্য থেকে কেবল আশিজন অবশিষ্ট থাকেন। আমরা অবিচল ছিলাম আর আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি নি, এবং এরাই তারা যাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লা প্রশান্তি নাযিল করেন। মহানবী (সা.) তাঁর খচ্চরের ওপরেই ছিলেন এবং এক পা-ও পিছু হটেন নি। তাঁর (সা.) খচ্চরটি সামান্য ঝুঁকলে তিনি (সা.) জিন থেকে নীচে হেলে পড়েন। আমি বলি, আপনি সোজা হয়ে বসুন; আল্লাহ্ আপনার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখুন। তিনি (সা.) বলেন, আমাকে এক মুঠো মাটি দাও। আমি মহানবী (সা.)-কে মুঠো ভরে মাটি দিলাম। এরপর তিনি (সা.) আমার কাছ থেকে সেই এক মুঠো মাটি নিয়ে শত্রুদের মুখ বরাবর নিক্ষেপ করলে তাদের চোখমুখ মাটি দিয়ে ভরে যায়। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, মুহাজিরীন ও আনসার কোথায়? আমি বলি, তারা এখানেই আছেন। তিনি (সা.) বলেন, তাদেরকে ডাকো। আমি তাদেরকে ডাকলাম। তারা (রা.) ডান হাতে নিজেদের তরবারি নিয়ে আসেন এবং মুশরিকরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায়।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, লোকজন যখন পালিয়ে যায়, অর্থাৎ মুসলিম সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, তখন মহানবী (সা.)-এর সাথে পাশে প্রায় একশজন অবশিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি (সা.) দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكٰى وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমরা তোমার কাছেই অভিযোগ করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, আপনার ওপর সেই বাক্যাবলিই অবতীর্ণ হয়েছে যা হযরত মূসা (আ.)-কে সমুদ্র বিদীর্ণ হবার দিন শেখানো হয়েছিল। হযরত হারেস বিন নুমান (রা.) বর্ণনা করেন, লোকজন যখন পিছু হটে তখন আমি অনুমান করি, মহানবী (সা.)-এর সাথে কেবল একশজন রয়েছেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, সেই দিন অর্থাৎ হুনাইনের যুদ্ধের দিন তাঁর (সা.) সাথে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) ছিলেন। তাঁরা সবাই দশটির অধিক করে আঘাত করেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-ও তাঁদের মাঝে ছিলেন। আর আনসারের মাঝ থেকে হযরত আবু দুজানা, হারেসা বিন নুমান (রা.), সা'দ বিন উবাদা (রা.), আবু বশীর (রা.), উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) এবং মক্কাবাসীদের মাঝ থেকে শায়বা বিন উসমান (রা.) অবিচল ছিলেন।

মহিলাদের মাঝে হযরত উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহান, উম্মে আম্মারা নুসীবা বিনতে কা'ব, উম্মে হারেস, উম্মে সুলায়েত বিনতে উবায়দ (রা.)-ও রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। মহিলা সাহাবীদের অবিচলতা প্রসঙ্গে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহান (রা.)-কে দেখেন, তিনি (রা.) তার স্বামী আবু তালহা (রা.)-র সাথে ছিলেন আর তিনি ছিলেন সন্তানসম্ভবা। তার আশঙ্কা ছিল, উট আবার তাদেরকে নীচে না ফেলে দেয়। তাই তিনি তার হাত উটের নাকে বাঁধা রশি ও লাগামের মাঝে রেখে উটের মাথা নিজের কাছে টেনে রাখেন। মহানবী (সা.) বলেন, উম্মে সুলায়েম নাকি? জবাবে তিনি (রা.) বলেন, জি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত! সেই ভদ্রমহিলার কাছে একটি খঞ্জর ছিল। হযরত আবু তালহা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! ইনি উম্মে সুলায়েম (রা.), তার কাছে খঞ্জর রয়েছে। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, এই খঞ্জর কী উদ্দেশ্যে? জবাবে উম্মে সুলায়েম (রা.) বলেন, আমি এজন্য এটি রেখেছি– যদি মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ আমার কাছে আসে তবে আমি তার পেট চিরে ফেলব। একথা শুনে মহানবী (সা.) মৃদু হাসেন। এমন বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতেও হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.)-কে একলা ফেলে লোকদের এভাবে পলায়নের ফলে তার (রা.) মনে এত গভীর বেদনা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার আতিশয্যে তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাদের পরে যেসব 'তুলাকা' অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা যোগ দিয়েছে; 'তুলাকা' হচ্ছে মক্কার সেসব অধিবাসী যাদেরকে মহানবী (সা.) لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ বলে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, আর যাদের মধ্য দুই হাজার হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং শত্রুদের অনবরত তির নিক্ষেপের কারণে পলায়ন করেছিল এবং পুরনো সাহাবীদেরকেও পিছু হটতে বাধ্য করেছিল– এতে তাদের উল্লেখ রয়েছে। যাহোক, তিনি বলেন, যারা আপনার (সা.) সাথে থাকা সত্ত্বেও পরাজিত হয়েছে– তাদেরকে, অর্থাৎ সেসব তুলাকাকে হত্যা করুন। মহানবী (সা.) বলেন, হে উম্মে সুলায়েম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের মোকাবিলায় যথেষ্ট হয়েছেন এবং তিনি অনুগ্রহ করেছেন।

আরেকজন বীরাঙ্গনা সাহাবীয়া হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বর্ণনা করেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন যখন লোকেরা পলায়ন করেছিল তখন আমরা চারজন নারী (যুদ্ধক্ষেত্রে) উপস্থিত ছিলাম। আমার কাছে অত্যন্ত ধারালো তরবারি ছিল এবং উম্মে সুলায়েমের কাছে ছিল খঞ্জর। আর তিনি সেই খঞ্জরটি তার কোমরে বেঁধে রেখেছিলেন এবং তিনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন। এছাড়াও হযরত উম্মে সুলায়েত (রা.) এবং উম্মে হারেসও (রা.) সেখানে ছিলেন। একটি বর্ণনানুযায়ী হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) উঁচু আওয়াজে বলতে আরম্ভ করেন, হে আনসার! পলায়নের সাথে তোমাদের কী সম্পর্ক? তিনি বলেন, আমি হাওয়াযিনের এক ব্যক্তিকে

দেখলাম, যে পতাকা উঁচিয়ে গোধূম বর্ণের উটে আরোহিত অবস্থায় ছিল। সে মুসলমানদের পিছু পিছু যাচ্ছিল। আমি তার সামনে এসে তার উটের পায়ের রগে আঘাত করি। তখন সেই আরোহী ব্যক্তি চিত হয়ে পড়ে যায়। এরপর আমি তার ওপর আক্রমণ করি এবং তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তরবারি দ্বারা উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকি। এরপর আমি তার তরবারি নিয়ে নিই। মহানবী (সা.) তাঁর তরবারি উঁচিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি যখন সেখানে পৌঁছাই তখন তিনি (সা.) উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন, হে সূরা বাকারার সাথিরা! তখনই আনসার আক্রমণ করতে করতে ফেরত আসেন। আর হাওয়াযিনের লোকেরা সাহাবীদের সামনে ততক্ষণই টিকতে পেরেছিল যতটুকু সময় উটনীর দুধ দোহন করতে লাগে। অর্থাৎ, তারা খুব স্বল্প সময় মোকাবিলা করতে পেরেছিল। এরপর শত্রুরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি শত্রুদের এরকম লাঞ্ছনাদায়ক পরাজয় কখনো দেখি নি। তারা যে যেদিকে পারে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমার ছেলে হুবাইব এবং আব্দুল্লাহ্ আমার নিকট ফেরত আসে আর তাদের কাছে যুদ্ধবন্দি ছিল।

হযরত আবু বশীর মাযানী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হুনাইনের যুদ্ধের দিন আমরা ভোরের (অর্থাৎ ফজরের) নামায পড়ি। অতঃপর আমরা সেই স্থানে পৌঁছি যেখানে মহানবী (সা.) আমাদেরকে দাঁড় করান। আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না– (কী ঘটতে যাচ্ছে।) সূর্য উঠি উঠি করছে– এমন সময় হঠাৎ আমাদের ওপর আক্রমণ হয়। আমাদের সৈন্যদলের অগ্রভাগ আমাদের পানে প্রত্যাবর্তন করে যারা পরাজিত হয়েছিল। আমাদের সৈন্য সারিগুলো এলোমেলো হয়ে যায় এবং আমরা সৈন্যদের সম্মুখভাগসহ পরাজিত হয়ে যাই। আমি প্রত্যাবর্তন করে সামনে অগ্রসর হই, কেননা আমি যুবক ছিলাম। যখন আমি জানতে পারলাম, মহানবী (সা.) সৈন্যবাহিনীর সম্মুখভাগে রয়েছেন, তখন আমি বলতে থাকি, হে আনসার! আমার পিতামাতা মহানবী (সা.)-এর জন্য উৎসর্গিত! তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছো? [এভাবে তিনি তাদেরকে ডাকেন।] আমি পরাজিত লোকদেরকে পুনরায় ফেরত পাঠাচ্ছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল কেবল মহানবী (সা.)-কে নিরাপদ অবস্থায় দেখা। এমনকি আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট পৌঁছে যাই। তখন তিনি (সা.) বলছিলেন, হে আনসার! হে আনসার! আমি তাঁর (সা.) বাহনের নিকট যাই। পেছন ফিরে আমি দেখতে পাই, আনসার সাহাবীরা তৎক্ষণাৎ ফেরত আসছিলেন আর মহানবী (সা.) নিজ বাহনে আরোহিত অবস্থায় শত্রুদের মুখোমুখি দণ্ডায়মান ছিলেন। তখন আনসার সাহাবীগণ মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং তারা মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। এরপর আনসার সাহাবীগণ শত্রুদের পিছু হটতে বাধ্য করেন, এমনকি আমরা তাদেরকে এক ফারসাখ অর্থাৎ তিন মাইল পর্যন্ত পিছু হটালাম। তারা গিরিপথে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং আমাদের কাছে পরাজিত হয়। অতঃপর মহানবী (সা.) তাঁর বাসস্থানে অর্থাৎ তাঁবুর দিকে ফিরে যান এবং বন্দিরা তাঁর (সা.) আশপাশে বাঁধা অবস্থায় রাখা ছিল। একটি দল তাঁর (সা.) তাঁবুর পাশে ছিল। মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর দুইজন সহধর্মিণী হযরত উম্মে সালামা (রা.) এবং হযরত যয়নব (রা.) ছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় হযরত উম্মে সালামা (রা.) এবং হযরত মায়মুনা (রা.)-র উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের আশেপাশে সেই দলটি ছিল যারা মহানবী (সা.)-কে পাহারা দিচ্ছিলেন। আর তারা হলেন আব্বাদ বিন বিশর (রা.), আবু নায়লা (রা.) এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)।

ইবনে উকবা (রা.) বর্ণনা করেন, কুরাইশের এক ব্যক্তি সাফওয়ান বিন উমাইয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তখনও মুশরিক ছিল আর হুনাইনের যুদ্ধের দৃশ্য দেখার জন্য

এসেছিল। সেই (কুরাইশ) ব্যক্তি বলে, তোমার জন্য সুসংবাদ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা পরাজিত হয়েছেন। [শুরুতে যে আক্রমণ হয়েছিল– সেটির প্রেক্ষিতে সে এই পরাজয়ের সংবাদ দেয়।] এরপর সেই মুশরিক বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! এখন তারা আর কখনো পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে না, অর্থাৎ তাদের এখন আর বিজয় লাভ হবে না। তখন সাফওয়ান বলে, তুমি আমাকে বেদুইনদের বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছো! আল্লাহ্‌র শপথ! বেদুইনদের সর্দার হবার চেয়ে কোনো কুরাইশের সর্দার হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়। শত্রুদের (বিজয়ের) কথা শুনে সাফওয়ান ক্রোধান্বিত হয়। সে তার এক দাসকে খবর নেবার জন্য প্রেরণ করে বলে, মনোযোগ দিয়ে শোনো তো– কাদের সংকেত ধ্বনি ভেসে আসছে? কেননা ততক্ষণে স্লোগানের ধ্বনিও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সে তার কাছে ফিরে এসে বলে, আমি তাদেরকে এ কথা বলতে শুনেছি, হে বনু আব্দুর রহমান! হে বনু উবায়দুল্লাহ্‌! হে বনু আব্দুল্লাহ্‌! সে বলে, মুহাম্মদ (সা.) বিজয় লাভ করেছেন; এটি তাদের যুদ্ধের সংকেত। এতে সাফওয়ান প্রশান্তি লাভ করে বলে, মুহাম্মদ (সা.) বিজয় লাভ করেছেন।

এ যুদ্ধে কাফিরদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর কঙ্কর নিক্ষেপ এবং দোয়া করার ব্যাপারে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়, যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন– আমাকে মাটি দাও, (আমি তা) নিক্ষেপ করব। এর বিশদ বিবরণ একস্থানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীদের প্রত্যাবর্তনের পর যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) যুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন আর তখন তিনি (সা.) নিজ খচ্চরের ওপর আরোহিত অবস্থায় ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে! বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) একমুঠো কঙ্কর নিয়ে সেগুলো কাফিরদের মুখ লক্ষ করে নিক্ষেপ করেন। এরপর বলেন, মুহাম্মদের প্রভুর শপথ! আরেকটি বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) বলেন, কা'বার প্রভুর শপথ! এই লোকেরা পরাজিত হয়েছে। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি দেখতে পেলাম, যুদ্ধ ঠিক সেভাবেই চলছিল যেমনটি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি দেখলাম, মহানবী (সা.)-এর কঙ্কর নিক্ষেপ করামাত্র তাদের (আক্রমণের) তীব্রতা হ্রাস পেতে আরম্ভ করল; অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণের তীব্রতা কমতে থাকে আর তাদের বিষয়টি উলটে যেতে থাকে, অর্থাৎ শত্রুরা পরাজয়ের দিকে ধাবিত হয়।

এর বিশদ বিবরণ এভাবে পাওয়া যায়, মহানবী (সা.) নিজের খচ্চরের ওপর আরোহিত অবস্থায় উভয় রেকাবের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে যান। এরপর তিনি (সা.) দুহাত তুলে এই দোয়া করেন, **اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَيْنَا** অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! আমি তোমাকে সেই প্রতিশ্রুতির দোহাই দিচ্ছি যা তুমি আমার সাথে করেছিলে। হে আল্লাহ্‌! এটি তাদের জন্য সমীচীন হবে না যে, তারা আমাদের ওপর বিজয় লাভ করবে আর আমরা পরাজিত হবো। ইয়াযীদ বিন আমর সুওয়াঈ বর্ণনা করেন; তিনি হুনাইনের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে ছিলেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হুনাইনের যুদ্ধের দিন ভূপৃষ্ঠ থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে মুশরিকদের দিকে তাকান এবং তাদের চেহারা লক্ষ করে তা নিক্ষেপ করেন। আর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। (তাদের) যে ব্যক্তিই নিজের ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করছিল সে নিজের চোখে কিছু বিদ্ধ হবার অনুযোগ করছিল আর নিজের চোখ কচলাচ্ছিল। অর্থাৎ শত্রুদের চোখে জ্বালা শুরু হয়। সেসময় মহানবী (সা.) দুলদুল নামক খচ্চরে আরোহিত ছিলেন। শায়বা বিন উসমান কুরাইশের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। তার পিতা

উসমান বিন তালহা উহুদের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এ ব্যক্তি মক্কা থেকে হুনাইনের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। কারো কারো মতে, মক্কা বিজয়ের সময় এ ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। সে নিজে বর্ণনা করে, আমি এই সংকল্প নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম যে, যখনই সুযোগ পাবো– আমার পিতার হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করে নিজের হৃদয়কে প্রশান্ত করব, নাউযুবিল্লাহ্। [এর অর্থ হলো, সে মুসলমান হয় নি।] ইসলামের সাথে বিরোধিতার এমন চিত্র ছিল যে, এ ব্যক্তি বলত, সমগ্র আরব ও অনারব বিশ্বও যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর কলেমা পাঠ করে তবুও আমি তাঁর অনুসরণ করব না। যাহোক, শায়বা যখন দেখল, মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করেছে এবং মুহাম্মদ (সা.) কেবল গুটিকতক লোকের মাঝে রয়েছেন; সে বর্ণনা করে, তখন আমি ভাবি, এখনই আমার জন্য উপযুক্ত সময়, তাঁকে হত্যা করতে পারব (নাউযুবিল্লাহ্)। সে বলে, আমি তাঁর ডান দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য সামনে অগ্রসর হলে সেখানে তাঁর চাচা আব্বাসকে দাঁড়ানো দেখতে পাই। তখন আমি চিন্তা করি, আব্বাসের উপস্থিতিতে মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি ঘুরে যাই এবং তাঁর বাম দিক থেকে আক্রমণ করার সংকল্প করি। তখন সেখানে দেখলাম, আবু সুফিয়ান বিন হারেস দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সেখান থেকেও ফেরত আসি এবং তাঁর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার সংকল্প করি। অতঃপর যখন আক্রমণ করার অভিপ্রায়ে সামনে অগ্রসর হই তখন চোখে হাত দিয়ে উলটো পায়ে দ্রুত পলায়ন করি। পরবর্তীতে সে বর্ণনা করত, ঠিক সে মুহূর্তে আমি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্‌গিরিত হতে দেখি; এমন মনে হয় যে, সেই স্ফুলিঙ্গ আমাকে ভস্ম করে দেবে। এরই মাঝে মহানবী (সা.) ডেকে বলেন, শায়বা! আমার কাছে আসো। তিনি (সা.) টের পেয়ে গিয়েছিলেন যে, এ ব্যক্তি পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর নিকটে গেলাম। তিনি (সা.) মৃদু হাসলেন এবং আমার বুকে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন আর দোয়া করলেন, اَللّٰهُمَّ أَذْهِبْ عنه الشَّيْطَانَ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি শয়তানকে এর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও। শায়বা বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! সাথে সাথেই মহানবী (সা.) আমার নিকট আমার কান, চোখ এবং আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হয়ে গেলেন আর আমার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে গেল। মহানবী (সা.) শায়বাকে বলেন, হে শায়বা! কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তিনি বর্ণনা করেন, এখন আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিরক্ষার জন্য শত্রুদের দিকে তরবারি নিয়ে অগ্রসর হই এবং মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় এমনভাবে যুদ্ধ করতে থাকি যে, তখন যদি আমার পিতাও আমার সামনে আসত তবে তাকেও আমি হত্যা করতাম।

এই ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও নিজের মতো করে বর্ণনা করে বলেন, মহানবী (সা.) সম্বন্ধে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তি বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল; কিন্তু তার অভিপ্রায় ছিল, (উভয়) সৈন্যবাহিনী যখন পরস্পর মুখোমুখি হবে তখন আমি সুযোগ বুঝে রসূলে করীম (সা.)-কে শহীদ করব। যুদ্ধ যখন প্রবলভাবে চলছিল তখন সে ব্যক্তি তরবারি বের করে। মহানবী (সা.) সে সময় একা ছিলেন, সাথে কেবল হযরত আব্বাস ছিলেন। সেই ব্যক্তি এটিকে মোক্ষম সুযোগ মনে করে সামনে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে চায়। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দেন, এ ব্যক্তির হৃদয়ে কপটতা আছে, অর্থাৎ শত্রুতা রয়েছে। সেই ব্যক্তি স্বয়ং বলে, আমি তাঁর (সা.) দিকে অগ্রসর হই এবং আমার ধারণা ছিল, এখন আমার তরবারি তাঁর (সা.) শিরশ্ছেদ করবে। কিন্তু আমি যখন তাঁর নিকটবর্তী হই

তখন তিনি (সা.) নিজের হাত আমার দিকে বাড়ান এবং বুকের ওপর রেখে বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি একে শয়তানী চিন্তাভাবনা থেকে পরিত্রাণ দাও এবং তার বিদ্বেষ দূর করে দাও। সেই ব্যক্তি বলে, তৎক্ষণাৎ আমার এমন মনে হলো, তাঁর (সা.) মতো প্রিয় আর কোনোকিছু নেই। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, সামনে অগ্রসর হও এবং যুদ্ধ করো। অতঃপর আমি তরবারি উঁচিয়ে ধরি। আর আল্লাহ্র শপথ! আমার পিতাও যদি সে সময় জীবিত থাকত এবং আমার সামনে এসে দাঁড়াত, তাহলে আমি আমার তরবারি তার বক্ষে বিদ্ধ করতাম অর্থাৎ গেঁথে দিতাম এবং সামান্যও দ্বিধা করতাম না। এই ভালোবাসাই তার শত্রুতা দূর করে দেয়। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা তার শত্রুতাকে মুছে দেয়। যুদ্ধ শেষ হবার পর মহানবী (সা.) যখন নিজ তাঁবুতে ফিরে আসেন তখন শায়বা বিন উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তখন তাকে বলেন, হে শায়বা! তুমি সে সময় যা কিছু পরিকল্পনা করছিলে, তার চেয়ে এখন খোদা তা'লা তোমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন– সেটি উত্তম। এরপর মহানবী (সা.) শায়বাকে সেই সকল বিষয় খুলে বলেন যা শায়বা যুদ্ধের ময়দানে হৃদয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। শায়বা তখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিজের পূর্বের সকল কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করেন এবং বলেন, غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন।

একইভাবে নুযায়ের বিন হারেসের কুমতলব এবং তার উত্তম পরিণতিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মক্কা থেকে খারাপ উদ্দেশ্য যারা হুনাইন অভিমুখী সৈন্যবাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল নুযায়ের বিন হারেস। সে কুরাইশ নেতাদের একজন ছিল এবং তার ভাই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, আমি আমার কিছু সঙ্গীসহ এই অভিপ্রায়ে হুনাইন অভিমুখে যাত্রা করেছিলাম যে, সুযোগ পাওয়ামাত্রই মুশরিকদের দলের আক্রমণকারীদের সাথে যোগ দেবো। আর মুসলমানরা যখন প্রথমদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তখন আমি মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে অগ্রসর হই। কিন্তু যখনই আমি তাঁর দিকে অগ্রসর হবার চিন্তা করি তখন আমি দেখি, তাঁর চারপাশে সাদা চেহারার কিছু লোক রয়েছে, যারা আমাকে বলছিল, এখান থেকে দূর হও! তাদের কণ্ঠে এমন ভীতিকর কিছু ছিল যে, আমি ভয় পেয়ে যাই আর আমি কাঁপতে থাকি। কিছুক্ষণ পরেই মুসলমানরা পুনরায় জড়ো হতে থাকে আর শত্রুদের ওপর আক্রমণ করে বসে। আমি তখন সেখান থেকে ফিরে যাই এবং গাছপালার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি। এভাবে কয়েক দিন পর্যন্ত আমি লুকিয়ে থাকি, কেননা যা কিছু আমি দেখেছিলাম সেই আতঙ্ক আমার মন থেকে দূর হচ্ছিল না। এরপর আমি জানতে পারি, মহানবী (সা.) তায়েফের দিকে চলে গেছেন এবং সেখান থেকে জিরানা গিয়ে পৌঁছেছেন। [এটি যুদ্ধ শেষ হবার পরের কথা।] আমি চিন্তা করি, এখন ইসলামের বিজয় হয়ে গেছে এবং অধিকাংশ মানুষ ইসলাম কবুল করে নিয়েছে, তাই আমিও মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে যাই। আমি গোপনে জিরানা গিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হই। মহানবী (সা.) আমাকে দেখে চিনে ফেলেন এবং বলেন, তুমি কি নুযায়ের? আমি নিবেদন করি, জি, হুযূর! আমিই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে তুমি যে (মন্দ) পরিকল্পনা করেছিলে তা থেকে এটি উত্তম। আর আল্লাহ্ তোমার এবং তোমার সেই মন্দ পরিকল্পনার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নুযায়ের বর্ণনা করে, আমি একথা শোনামাত্র দ্রুত মহানবী (সা.)-এর দিকে এগিয়ে যাই আর নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য যদি থাকত তাহলে সে

আমার কোনো উপকারে আসত। এরপর সে কলেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করে বলেন, اَللّٰهُمَّ زِدْهُ ثَبَاتًا অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাকে অধিক দৃঢ়তা প্রদান করো। নুযায়ের বলে, আল্লাহ্র শপথ! মহানবী (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে আমার হৃদয় দৃঢ়তার দিক থেকে পাথরসম হয়ে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র– যিনি তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন।

হুনাইনের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করার সময় মহানবী (সা.) কতিপয় কুরাইশ নেতৃস্থানীয় নবদীক্ষিত মুসলমানের মনস্তুষ্টির জন্য একশ করে উট প্রদান করেছিলেন। নুযায়ের বিন হারেসও তাদের অন্যতম। তিনি তখন এতটাই আত্মমর্যাদা প্রদর্শন করেন, যা প্রকৃতপক্ষে তার ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা লাভের জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়ার সুপ্রভাব ছিল। এক ব্যক্তি এসে তাকে সংবাদ দেয়, মহানবী (সা.) আপনাকে একশ উট প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন, সুতরাং উটগুলো নিয়ে নিন। এটি শুনে নুযায়ের তাকে বলেন, মহানবী (সা.) তো মনস্তুষ্টির জন্য এগুলো দিচ্ছেন, এজন্য আমি এই উট নেব না; অর্থাৎ আমি তো আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ইসলামের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, আমার মনস্তুষ্টির জন্য এমন সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য পরক্ষণে নিজেই বলেন, আমি তো মহানবী (সা.)-এর নিকট এই সম্পদ চাই নি আর কোনো যাচনাও করি নি। এটি তো মহানবী (সা.) নিজ থেকে দান করেছেন এবং উপহারস্বরূপ দিয়েছেন, তাই এটি নিতে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়। তিনি সংবাদ প্রদানকারীকে সেসব উট থেকে ১০টি উট দিয়ে দেন এবং বাকি উট নিজে রাখেন।

পরবর্তীতে নুযায়ের প্রায়ই একথার উল্লেখ করতেন যে, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা– আমরা সেই শিরকে নিপতিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি নি, যার ওপর আমাদের পিতৃপুরুষরা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার ইসলাম খুবই উন্নত মানের ছিল। তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে যান এবং সেখান থেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেন। অতঃপর ১৫ হিজরীতে ইয়ারমুক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। বাকি ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)